টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সম্ভব কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১০ই বৈশাখ বুধবার, ১৩৭৬ ইং 23rd April 1969 | ৪৮-শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরানো পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ

এই তো খেলার দিন—

ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিণ্টন।

উল ও প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি পাওয়া যায়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—খেলা ঘর

রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী, মুর্শিদাবাদ

শুভানুধ্যায়ী পৃষ্ঠপোষকদের উদ্দেশ্যে জানাই নব-বর্ষের আন্তরিক অভিনন্দন, প্রীতি ও শুভেচ্ছা

ষ্টুডেণ্টস্ ফেভারিট

রঘুনাথগঞ্জ — ফোন ৪৪

বিঃ দ্রঃ — রবীন্দ্র জন্ম পক্ষে বিশেষ কমিশন আপনার প্রয়োজনীয় বইয়ের অর্ডার দিন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই বৈশাখ বুধবার সন ১৩৭৬ সাল।

॥ ১৩ই বৈশাখের প্রত্যাবর্ত্তন ॥

১৩ই বৈশাখ আবার ফিরিয়া আসিতেছে

গত বছরের এই দিনটি আমাদেব মনে আছে। সেদিন ছিল দাদাঠাকুরের জন্মদিন। আর সেইদিনই তিনি মর্ত্যমাটির উর্দ্ধলোকে চলিয়া যান। বাংলার সমাজ, বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের দরবারের একটি বিশিষ্ট আসন শূন্য হইয়া গিয়াছে। বাংলার প্রতিটি জিনিসে তাঁহার মমতা মাখান ছিল। গ্রাম-বাংলার এক সার্থক রূপকার ছিলেন দাদাঠাকুর।

কর্মের সাধনা লইয়াই তাঁহার জীবনযাত্রা শুরু হইয়াছিল। যত রকমের প্রতিকূল অবস্থা ও পরিবেশ মানুষের ভাগ্যকে বিড়ম্বিত করিতে পারে, তাহা তাঁহার ভাগ্যেও জুটিয়াছিল। শৈশবেই তিনি মা-বাবাকে হারান। আর সেই অভাব পূরণ করিয়াছিলেন তাঁহার পিতৃব্য। এই অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে দাদাঠাকুরের বজ্রকঠিন চরিত্র ও কুসুমকোমল প্রাণ গঠিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহার বিভিন্ন লেখায়, কথায়, গানে, কবিতায় যে ব্যঙ্গের তীব্র কশাঘাত, আমরা দেখি, তাহা আমাদের সমাজ-জীবনের নানা পঙ্কিলতা ও আবিলতাকে লক্ষ্য করিয়া। বাঙ্গালী চরিত্রে যখন স্বাবলম্বনের অভাব, তখন তাঁহাকে দেখা গেল রাস্তায় রাস্তায় স্বরচিত 'বোতল পুরাণ' ফিরি করিতে এবং গাহিতে—'হিউমার, স্যাটায়ার, উইট আর ইন মাই পাব্‌লিকেশন্'। লোকভয়ের জলন্ত প্রতিবাদ। একদিকে নিষ্ঠুর পণপ্রথা,—অপরদিকে নব্যশিক্ষিতা বধুর কর্তব্যে অবহেলা যখন সমাজকে বিষাক্ত করিতেছে তখন তাঁহার লেখনীমুখে আসিল—"কি কুক্ষণে লক্ষ্মীছাড়ী ঢুকলি এসে আমার ঘর, অমন আমার সোনার বাছায় কী মন্ত্রে করলি পর। .....নিজের মন্দ নিজেই করেছ ঝগড়ায় আর নাহিক ফল, কী আর হইবে বল মিছামিছি গোড়া কেটে দিয়ে আগায় জল" ইত্যাদি। উপেক্ষিত ও নিপীড়িত মানুষের মুখে ভাষা দিলেন জনজাগরণের—'বাঁশি বাজরে বাজ, বাবুরা সব মোদের কাছে হার মানিবে আজ।..... ঠ্যাংএর ওপর ঠ্যাংটি দিয়ে খেতে বাবা দুধে ঘিয়ে, তখন লাগত না ক লাজ। ...লুটো বলে ডাকতে ভারি, এখন আমি লুটবিহারী' ইত্যাদি। তাঁহার এই বাঁশির সুরে স্বার্থান্বেষী হৃদয়হীন ও শোষক ধনিক সম্প্রদায়ের বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। সাম্যবাদের যে গান তৎকালে তিনি গাহিয়াছিলেন, তাহা পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সার্থক জেহাদ ঘোষণা। আমলাতন্ত্রের জুলুমবাজী, জাতিভেদ প্রথার তুচ্ছ সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতিতে তাঁহার প্রতিবাদ সোচ্চার ছিল। শুধু প্রতিবাদ বা কেন, তিনি অনেক সময় ইহার প্রতিবিধানও করেন। নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া তিনি ইংরাজ শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মানুষদের গোপনে যেভাবে সাহায্য করিতেন, তাহা গল্প হইলেও সত্য।

কর্মনিষ্ঠা, কর্মযোগী দাদাঠাকুরের জীবনের এক অপরিহার্য মূলমন্ত্র ছিল। কথায় ও কাজে অসামঞ্জস্যবিধানে যেখানে আমাদের প্রবৃত্তি, তিনি সেখানে ছিলেন খড়্গহস্ত। প্রকৃতপক্ষে সমাজের নানা অসঙ্গতি জাতীয় জীবনকে নানাভাবে পঙ্গু করিয়া জাতীয় চরিত্রে ঘূণ ধরাইয়া দিতেছিল। দাদাঠাকুরের জীবনচর্যা সেখানে জাতি গঠনের ব্রত লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিল।

হাস্যপরিহাসে অদ্বিতীয় ছিলেন তিনি। পনের বৎসরকাল কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের তিনি নিয়মিত বক্তা ছিলেন। এই সুদীর্ঘ সময় তাঁহার রসরচনা বাংলা সাহিত্যের একটি দিককে উজ্জ্বল করিয়াছিল।

তাঁহার কুসুমকোমল প্রাণের কথা অনেকেই জানেন। কত দুঃস্থকে তিনি গোপনে সাধ্যমত সাহায্য দিতেন, তাহা পত্র-পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে ফলাও না হইলেও যেখানে শাশ্বতকালের হিসাব-নিকাশ হয়, সেখানে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। আত্মপ্রচার তাঁহার জীবনের ধর্ম ছিল না। তাই ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহাকে একটি সাদাসিধা, অতি অনাড়ম্বর মানুষটি দেখিয়াছি। সরল ছিল তাঁহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। দীর্ঘদিন তিনি দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। উত্তরকালে যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখিলেন, তখনও তিনি ভুলেন নাই যে, তিনি একদা কত অসহায় ছিলেন। আর সেইজন্যই মুড়ি-চিড়া-ছাতু-গুড় তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। তাঁহার স্পষ্টবাদিতা, নির্ভীকতা, স্বাবলম্বিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়া মনে হয়, বাংলার সমাজ-জীবনের অন্ধতমসায় তিনি একটি সংগ্রামশীল দীপশিখা।

আগামী ১৩ই বৈশাখ তাঁহার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। আমরা এই অমর আত্মার প্রতি আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

———

যুগপ্রতিনিধি দাদাঠাকুর

—ডঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

[দাদাঠাকুর রাঢ় বঙ্গের প্রতিভাদীপ্ত একটি বিশিষ্ট মনীষা। বাক্-চাতুর্য ও রস-রসিকতায় তাঁহার প্রতিভা উজ্জ্বল। শ্রদ্ধেয় ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার এই আলোচনার মধ্যে দাদাঠাকুরের ব্যক্তিত্ব, সংযম, নিষ্ঠা ও সর্ব্বোপরি তাঁহার বুদ্ধিদৃপ্ত বাচসিকতার মূল্যায়ণ করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার মূল্যবান রচনাটি আমাকে পাঠাইয়া আমার পিতৃদেবের (দাদাঠাকুর) প্রতি তাঁহার ভক্তিপ্লুত চিত্তের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছেন। —সম্পাদক]

শরৎ দা'র তিরোভাবের পর এক বর্ষ অতীত হয়েছে সেই কথাটি—নূতন করে স্মরণ করলাম। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও রসিকতা দুটোই অনন্য। আমাদের রাঢ় অঞ্চলের আপাত-রুক্ষ বহির্জীবন যাত্রার তলদেশে যে স্নিগ্ধ রসধারা প্রবাহিত তা' তাঁর ব্যক্তিত্বে ও রসরচনায় অপরূপভাবে ফুটে উঠেছে। রাঢ় যে শুধু ঋণী অঞ্চল নয়, তার যে বঙ্গসংস্কৃতির বিচিত্র ধারায় কিছু নিজস্ব উপহার দেবার আছে তা' তিনি সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রাঢ়ের যে সঙ্কীর্ণ ও অমার্জিত লোকজীবন ও আচরণ বিধি সেই রূঢ় আবরণ তলে একটি দুর্জয় চরিত্র-গৌরব ও হাস্যরসের ফল্গুধারা লুকোন আছে তা' তাঁকে দেখলেই বোঝা যায়। বাংলা দেশের সারস্বত অর্ঘ্যথালে তিনি যে খাঁটি দেশী নৈবেদ্য সাজিয়ে দিয়েছেন তার মধ্যে হয়ত আধুনিকতার পালিশ নাই, কিন্তু তার ঝাঁঝালো স্বাদ সদ্য-আহরিত, নির্ভেজাল রসে পরম উপভোগ্য। রাঢ়ের আকের গুড় বা শাক-সব্জির অপূর্ব মিষ্ট আস্বাদনের ন্যায় তাহা তুলনা-রহিত। তা' হয়ত সূক্ষ্ম রুচিবাগীশের পাতে পরিবেশন করা যায় না, কিন্তু তা' শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে প্রাকৃতজন উপভোগ্য।

বীরভূমের কবি বা জঙ্গীপুরের ঝুমুরের মত তাতে আঞ্চলিক মনের ছাপটি সুস্পষ্ট, অথচ সরসতায় ও শিল্প কৌশলে তা' উচ্চ আর্টের পর্যায়ে উন্নীত। এর স্থূলতা বা ইতরতা প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা ও প্রাণোচ্ছলনার গুণে জীবনশিল্পের উন্নত মর্যাদায় আরূঢ়। তিনি রাঢ়ের গ্রাম্যসংস্কৃতিকে বিদগ্ধরুচির সপ্তম স্বর্গে উঠিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে তিনি বাংলার শেষ খাঁটি কবি। যদি দাদাঠাকুর বঙ্কিমের আমলে জীবিত থাকতেন তবে সাহিত্য-সম্রাটের এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই পালটিয়ে যেত। ঈশ্বর গুপ্ত তবু সহরের বাসিন্দা ও কবি ছিলেন। পৌষপার্বণের পিঠেপুলির স্বাদ তাঁর রসনার স্মৃতিতে লেগে ছিল, তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় কতটুকু ছিল তা' অনিশ্চিত। আর সে যুগে কলিকাতা ও পল্লীর সংযোগসূত্র এখনকার মত মর্মান্তিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয় নি। তখন পল্লীর অনেক আচার-সংস্কার ও অনেক উৎসব কলকাতার মধ্যেই জীবন্ত ছিল। কিন্তু দাদাঠাকুরের রাঢ় কলিকাতা রাজধানীর ঠিক বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। বরং কলকাতার অনেক কৃত্রিম প্রথা, অনেক সভ্যতার বাইরের পালিশ পল্লীসমাজের সরল জীবনধারার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাকে আরও অন্তর্জীর্ণ করে তুলছিল। স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানে ভোট-মারফৎ মাতব্বরি করার প্রলোভন তখন পল্লীসহরের এক প্রতিপত্তিশালী অংশকে পেয়ে বসেছিল ও তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানা দুর্নীতিপ্রয়োগে প্ররোচিত করছিল। জনসেবার ছদ্মবেশী এই স্বার্থসিদ্ধি দাদাঠাকুরের তীক্ষ্ণতম ব্যঙ্গাস্ত্রক্ষেপকে উদ্রিক্ত করেছিল। খাঁটির সঙ্গে মেকীর যে আপোষহীন সংগ্রাম তাই নানারূপে দাদাঠাকুরের জীবনে ও সাহিত্যে অভিব্যক্ত হয়েছিল। এই খাঁটির প্রতি চিরানুগত্য তাঁর চরিত্র গৌরবের উজ্জ্বলতম নিদর্শন। তাঁর ছেঁড়া পরিধেয় ও অনাবৃত দেহ তাঁর অতিপ্রসাধিত বর্তমান সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার উদ্যত নিশান। তাঁর পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঠনঠনের চটি ও ঠেঁঠি থান তাঁর মানস আভিজাত্যের সাধিত সারল্যের সূচক। কিন্তু তাঁর বাঙালী সমাজে ও সাহিত্যে স্থান এতই সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্বস্বীকৃত যে তাঁর পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য সেখানে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ছিল। তিনি নিজের স্বভাবগুণে সমাজ ও সংস্কৃতির যে চূড়ায় আরোহণ করেছিলেন, সেখানে তাঁর বেশ-ভূষার গৌণ সহায়তা একেবারেই তুচ্ছ। তিনি ঐশ্বর্যশালী না হয়েও অভাবগ্রস্তের অভাবমোচনের জন্য যে দানভাণ্ডার অবারিত করেছিলেন, যে নেতৃত্বের আসনটিতে আপন অধিকার অতি সহজে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেখানে দারিদ্র্য ধিক্কৃত হয়ে নিজ স্বরূপকে অস্বীকার করেছিল। হিমালয়ের তুঙ্গ শৃঙ্গের বন্ধুর নগ্নতা সমস্ত শ্যামসুষমার বহিশ্ছদ্দব্যতিরেকেই আমাদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকর্ষণ করে।

বিদ্যাসাগরের পক্ষে যে অলঙ্কাররিক্ততা সহজ ও শোভন হয়েছিল, আমাদের সমাজ-জীবনে অতি নগণ্য ও দারিদ্র্যের সঙ্গে আজীবন সংগ্রামে ব্যাপৃত এক পাড়াগেঁয়ে ব্রাহ্মণ শরৎ পণ্ডিতের ক্ষেত্রে তা' নিশ্চয়ই অসমসাহসিক। কিন্তু কারণটা একই। বিদ্যাসাগর জানতেন তাঁর চটিজুতামণ্ডিত দু'খানি ফাটা পায়ের কাছে সমস্ত মুকুটভূষিত মণ্ডল ভূমিলুণ্ঠিত হয়ে প্রণত হবে। কাজেই সেই বিশ্ববন্দিত চরণযুগল তিনি অসঙ্কুচিতভাবে শ্রদ্ধার্ঘ্যের জন্য প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সহায় সম্পদহীন এক তুচ্ছ ব্রাহ্মণও শুধু নিজ সত্য ও ন্যায় বলে বলীয়ান হয়ে সেই দুঃসাহস হেলায় দেখিয়েছেন। যে দৃপ্তদৃষ্টিতে কণামাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমস্ত চিত্রিত খড়-কুটার পুঞ্জীভূত উচ্চতার দিকে চায়, যে দুর্জয় অধ্যাত্ম-শক্তিতে আমাদের সনাতন ব্রাহ্মণ্য তেজঃ শ্রেষ্ঠীধনিকের অপরিমিত ধন সঞ্চয়ের দিকে অভিশাপের অসহ্য আগুন ছড়ায়, কপর্দকহীন শরৎ পণ্ডিতও সেই অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে সমস্ত অভিজাত সমাজের অন্তর্জীর্ণতার দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। তিনি পরধনের কাছে ভিক্ষুক ছিলেন না বলেই, আত্মনির্ভরশীল, বিবেকবান দারিদ্র্যের স্পষ্টভাষিতার আদর্শ থেকে কোনও দিন চ্যুত হন নি। তাঁর এই নির্লোভ সত্যনিষ্ঠা, তাঁর চরিত্রের এই মহৎ আত্মপ্রত্যয়, তাঁর উদ্দেশ্যের একান্ত সততাই তাঁর জনপ্রিয়তা ও তাঁর সমাজে প্রতিষ্ঠার একমাত্র কারণ। তিনি সহরের সাংস্কৃতিক

পরিমণ্ডলে, উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগোষ্ঠীর মজলিসে এসেও নিজের রেঢ়ো টান, মেঠো ভাষা ও স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা ও স্পষ্টভাষণ এক তিলও ছাড়েন নাই। যে খাঁটি সে সকল আসরেই শোভা পায়—তাকে আসর অনুসারে ভোল বদলাতে হয় না। সে ষোল শ গোপিনীর মধ্যে একাই কৃষ্ণ। এই নকল সমাজে তার মান সর্বত্র বজায় থাকে। তাঁর আঘাতের তীব্রতা, রসিকতার ফোয়ারা, বাক্‌পটুতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সব পরিবেশেই সমান সক্রিয়।

ভগবান কাউকে কাউকে ব্যঙ্গরসিক করেই সৃষ্টি করেন। তাঁর তির্যক দৃষ্টিতে সমাজ ও আচরণের যেখানে যেটুকু অসঙ্গতি আছে তা' তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে ও প্রসন্ন কৌতুকের সঙ্গে তিনি তা' উপভোগ বা বিতরণ করেন। কিন্তু এ সবের পিছনে অতন্দ্র সত্যনিষ্ঠা ও অকৃত্রিম চরিত্রবিশুদ্ধি না থাকলে কোন ব্যঙ্গরসিকই পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারেন না। দাদাঠাকুরের রসিকতার পিছনে এই সব গুণই ছিল। তিনি আজ যেটা আবিষ্কার করলেন দেখতে দেখতে তা' সমাজ চেতনায় ছড়িয়ে গিয়ে সার্বভৌম অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে সঞ্চিত হল। তাঁর কলকাতার পাড়ার নামকরণ প্রমাদ অবিলম্বে সমস্ত কলকাতাবাসীর সচমক স্বীকৃতি লাভ করল। যে দৃষ্টি জড় অভ্যাসের বশে অন্ধ ছিল তা' কৌতুকময় সত্য-রশ্মিচ্ছটায় খুলে গেল।

এই গতানুগতিকতার যুগে গোষ্ঠীর চাপে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য খর্ব এমন কি সম্পূর্ণ লুপ্ত হতে চলেছে। আমাদের মত এখন সমষ্টিমতের প্রতিধ্বনি হয়ে পড়েছে। যে প্রবাদবাক্য শৃগাল সম্বন্ধে সত্য ছিল, তা' এখন মানুষের প্রতিও সমভাবে প্রযোজ্য। আজ শুধু সব শিয়ালের এক রা নয়, সব মানুষেরও একই রা। আজ পোষাক, জামা, জুতার ন্যায় ব্যক্তিস্বভাবও কর্মে ফরমায়েসী মত তৈরী হচ্ছে। আজ মানুষ নিজের কণ্ঠে কথা কয় না, দলের কণ্ঠে গ্রামোফোন বাজায়। এ হেন যুগে দাদাঠাকুরের মত একজন নিজস্ব মত-ওয়ালা ব্যক্তির আবির্ভাব একটা দলছাড়া ব্যাপার। ব্যক্তিত্বের লুপ্তপ্রায় মহিমা তিনি আবার সগৌরবে উদ্ধার করেছেন। আর তার চেয়ে বেশীও তিনি এগিয়ে গেছেন। তিনিই বোধ হয় এ যুগের শেষ মানুষ, যিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠানের মর্যাদায় আসীন হয়েছেন। দাদাঠাকুর শুধু ব্যক্তি নন, তিনি একাই একজন যুগ-প্রতিনিধি। আর সংস্কৃতির ইতিহাসে উপেক্ষিত রাঢ় দেশ তাঁর মাধ্যমেই একটি সার্বভৌম পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেছে। তাঁর তীক্ষ্ণ বাক্‌বৈদগ্ধ্যের মধ্যে রাঢ়ের কাহিনী, প্রবাদ-কিংবদন্তী, দেশপ্রচলিত হাসি-তামাসা, তার মনোভঙ্গী ও আত্মপ্রকাশের বৈশিষ্ট্য সর্ববাঙলার বৃহত্তর পটভূমিকায় এক স্মরণীয় স্থান পেয়েছে। আজ তাঁর তিরোভাবের প্রথম বার্ষিকী তিথিতে তাঁর প্রতিনিধিত্বমূলক পরিচয়ের স্বীকৃতি হওয়া প্রয়োজন ও রাঢ়ের অধিবাসীদের মনে তাদের সংস্কৃতি স্বাতন্ত্র্যের সংরক্ষণের সদিচ্ছা জাগান উচিত। আমি তাঁর অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে ধন্য হলাম।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের তুলনা খুঁজে পাই না

—পরিমল গোস্বামী

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত সম্পূর্ণ বাঙালী ছিলেন, কারণ তিনি যাঁদের সংস্পর্শেই এসেছেন তাঁরাই তাঁকে পরম আত্মীয় মনে করেছেন। অথচ তিনি সাধারণ বাঙালীদের চেয়ে এমন স্বতন্ত্র ছিলেন যে, এক এক সময় মনে হয়েছে তিনি আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। কোন্ সে স্বাতন্ত্র্য যা তাঁকে আত্মীয় বলে চিনিয়েছে, অথচ তাঁকে কেউ বেঁধে রাখতে পারেনি।

এই স্বাতন্ত্র্য আমার মনে হয় তাঁর অনলস কর্মপ্রবৃত্তি। জীবনের আরম্ভ থেকেই কোনোদিন কোথাও তিনি থেমে থাকেননি, শত রকম কাজের ভিতর দিয়েই তিনি জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। জীবনটাকে তিনি বহু বন্ধনের মধ্যেও এমন আশ্চর্য এক অনাসক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যার তুলনা তো আর কোথাও দেখি না। কখনো ভেবেছেন জীবন-মঞ্চে তিনি অভিনেতা মাত্র, এবং সে কথা অকুণ্ঠচিত্তে প্রকাশ করেছেন। কখনো ভেবেছেন তিনি সমাজের প্রতি তাঁর কর্তব্য পালন করতে এসেছেন, তাঁর জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। কখনো ভেবেছেন তিনি বিদূষক মাত্র, লোককে আনন্দ দেওয়াই তাঁর কাজ। কিন্তু এ রকম ভাবার মধ্যেও তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ খুঁজে পাননি। তাঁর জীবনের আদর্শ তাঁর মনের গভীরে অবস্থিত ছিল, সম্ভবত তাঁর নিজেরই কাছে তা অজ্ঞাত ছিল। তিনি তা জানতেও চাননি কখনো, কারণ দরকার হয়নি।

তিনি কখনো গুরু সাজেননি, অন্যের উপর কর্তৃত্ব করতে চাননি, শিশুর মতো সবার সঙ্গে খেলাই ছিল তাঁর কাজ। অথচ যেখানে অন্যায়, সেখানে তার বিরুদ্ধে তিনি নির্ভীক যোদ্ধা। যুদ্ধ শেষে পুনরায় শিশু। সবই তাঁর খেলা। শব্দ নিয়ে খেলা, কবিতা নিয়ে খেলা, কাগজ সম্পাদনাও খেলা। এই খেলা কখনো বিশুদ্ধ আনন্দের জন্য, কখনো দুষ্টকে দমনের জন্য। এবং কখনো তা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়।

জীবনে কখনো তিনি লোকাচার মানেননি, অন্যের অনুকরণ করেননি, কিন্তু তাঁর চরিত্রের অপরিসীম স্বাতন্ত্র্যে তিনি এতই বড় ছিলেন যে, ধনীর শির শ্রদ্ধায় ভালবাসায় আনন্দে তাঁর পায়ে নত হয়েছে। লোকে কি বলবে বা ভাববে তাঁর সমস্ত আচরণের মধ্যে এ কথা তাঁর কখনো মনে আসেনি। সকল পরিবেশে তাঁর স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ ছিল, কোনো অবস্থায় কারো খাতির পাবার আশায়, অনুগ্রহ লাভের আশায়, সে স্বাতন্ত্র্য তিনি ছাড়েননি। অন্যের অনুগ্রহ তাঁর জীবনে প্রয়োজন হয়নি। দারিদ্র্যকে তিনি গৌরবান্বিত করেছিলেন নির্লোভের দ্বারা।

এমন সরলতা, এমন সদাশয়তা, এমন চরিত্র মাধুর্য, অথচ অন্যদিকে ইস্পাতের মতো ধারালো এবং দৃঢ়। সিংহের মতো দুর্জয়। এমন আশ্চর্য বাঙালী আমি আর দ্বিতীয় কল্পনা করতে পারি না।

দাদাঠাকুরের কথা

—শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

দেখতে দেখতে দাদাঠাকুরের স্মৃতি বার্ষিকীর দিন এগিয়ে এল। পৃথিবীতে এক সময় যাঁর সঙ্গে দীর্ঘদিন হাস্য-পরিহাসে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেছে, সেই মানুষটির দেখা আবার কোনদিন কোন জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে পাওয়া যাবে কি না জানি না—তবে এ জন্মে যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁদের মৃত্যুকাল পর্যন্ত দাদাঠাকুর যে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দাদাঠাকুরের সঙ্গে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরে অতি ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, তাঁকে শুধু আমি রসিক-পুরুষ বলে শ্রদ্ধা করতাম না—তাঁর হৃদয়ের বিরাট পরিধি, আত্মবিশ্বাস, ঔদার্য, সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ, লোভপরিশূন্য মানসিক সবলতা ও মানুষের প্রতি দরদ আমাকে বারবার মুগ্ধ করেছে। দারিদ্র্যকে এত স্বাভাবিক ও হাসিমুখে উপেক্ষা করার শক্তি এ যুগে অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখেছি। তাঁর সঙ্গে স্বল্প কয়েকজন ধনী ব্যক্তির পরিচয় ছিল না—ইচ্ছা করলে তাঁদের মারফৎ তিনি তাঁর সন্তানদের যে কোন অর্থকরী ব্যবসায় বা চাকুরিতে নিয়োগ করিয়ে দিতে পারতেন—কিন্তু কখনও কাউকে নিজের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোন ব্যাপারে কিছু করার জন্য অনুরোধ জানান নি। এ যুগের কোন ব্যক্তির পক্ষে এটি না করাই বিস্ময়কর।

দাদাঠাকুর অন্তরে অন্তরে ছিলেন স্বদেশ প্রেমিক এবং তার জন্য বিপ্লবীদের ছিলেন বিশেষ সহায়ক। কত বিপ্লবী যে তাঁর সহায়তা লাভ করেছে তার সংখ্যা করা যায় না। এই বিপ্লবের সাহায্যে স্বদেশ স্বাধীনতা লাভ করবে এবং দেশের দারিদ্র্যের সমাধান ঘটানো যাবে, একথা তিনি বিশ্বাস করতেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি ছিল তাঁর গভীর ভালবাসা এবং নেতাজীও তাঁকে অসীম শ্রদ্ধা করতেন।

'দারিদ্র্যের সম্মান ধনীদের সম্মানের চেয়ে কম নয়' এই কারণে তিনি সারাজীবন কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে বিজয়ীর মত নগ্নপদে, মাত্র গায়ে একটি চাদর দিয়ে প্রখর রৌদ্রে কলকাতার পিচ্-ঢালা পথেও দ্বিপ্রহরে ঘুরে বেড়াতেন। যদি কখনও বলেছি, দাদা ট্রামে আসুন না, আমার সঙ্গে—তিনি ঠাট্টা করে বলেছেন, বীরেন ভায়া, যেতুম, কিন্তু অব্যেস খারাপ হয়ে যাবে। সব দিন সব সময়ে তুমি তো আমার সঙ্গে থাকবে না, তখন কেবলই মনে পড়বে, আহা বীরেন যদি থাকতো তাহ'লে আমায় ট্রামে করে নিয়ে যেত। সারাক্ষণ সেই দুঃখে আমার হাঁটতে আরও কষ্ট হ'ত; তার চেয়ে কারুর প্রত্যাশায় না থেকে নিজে হেঁটে যাওয়াই ভাল নয় কি?

সত্যই দাদা কখনও কারুর প্রত্যাশায় থাকতেন না। জীবনকে এত সহজভাবে মেনে নিতে আমি কাউকে দেখিনি। বলতেন, জান বীরেন, ভাগ্যে গরীব হয়ে জন্মেছিলুম তাতে তোমার বৌদি এখন খুব কষ্ট করলেও পরে সুখে থাকবে একথাটা আমি তাকেও বোঝাতে চেষ্টা করি। সে রেগে ওঠে।

আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, সেটা কি রকম কথা হ'ল দাদা? স্বামী বেঁচে থাকলে সুখ হয় না, আর তার মৃত্যুর পরে আনন্দ হয়—এটা হতে পারে?

বড়লোকদের বৌয়েদের হয় না—কিন্তু গরীবদের বৌয়েদের হয়। কারণ কি জান? গরীবদের বৌ এর হাতে থাকে দুগাছা কাঁচের রুলি—দুম্ দুম্ করে ভেঙে ফেললে, আর মায়া রইল না কিছুর কিন্তু বড়লোকের মেয়েদের গা-ভরা গয়না যখন টেনে টেনে খোলা হবে তখন তাদের স্বামী হারানোর চেয়ে গয়না হারানোর দুঃখুটা কি রকম হতে পারে কল্পনা করে দেখো! কেঁদে কেটে তারা তো কুরুক্ষেত্তর করবে।

আমি তাঁর কথা শুনে হো হো করে হাসতে সুরু করে দিলুম—এত বড় একটা ট্র্যাজেডীকেও দাদাঠাকুর যে কি ভাবে কমেডিতে পরিণত করতে পারেন তা তাঁর অনবদ্য ভঙ্গীতে এই ব্যাপারটির বিবরণ না শুনলে লিখে আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না।

রসিকতায় তিনি যে অদ্বিতীয় ছিলেন সে সম্বন্ধে কারুর দ্বি-মত নেই—কিন্তু তাঁর স্নেহভাজন যারা ছিল তাদের প্রতি অসীম দরদ ছিল তাঁর। আমার পিতার মৃত্যুর পর প্রতিদিন আমার বাড়ীতে গিয়ে কী সান্ত্বনাই না দিতেন। তার মধ্যেও কিন্তু সরসতার অসদ্ভাব ঘটতো না। পিতৃদেবের মৃত্যুর পর আমাদের পল্লীর এক গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে বিরাট শোকসভা হয়—সেখানে দাদাঠাকুর চলে এলেন এবং পিতার স্মৃতিকথা বিবৃত করে সর্বশেষে বলে উঠলেন, দেখুন যিনি গেলেন তিনি একজন বিরাট মানুষ ছিলেন—এই পল্লীর মধ্যে এমন জনপ্রিয় ব্যক্তি খুব কমই আছেন—তাঁর অভাবে সকলের দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক—কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে তাঁর পুত্রদের নিয়ে—কারণ, বাপের নাম বজায় রাখতে হিমসিম খাবে ওরা। তা যদি না পারে তাহলে ওরাও ডুববে তিনিও বিস্মৃতির গর্ভে চলে যাবেন। বড় বাপের ছেলে হওয়া বড় দায়িত্বের কাজ। আমি আশা করব রায় সাহেব কালীকৃষ্ণ ভদ্রের নাম বজায় রাখবার জন্য যেন ওরা তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করে চলে।

দাদাঠাকুরের প্রীতি আমার স্ত্রী পুত্র কন্যারা যথেষ্ট পেয়েছে—তিনি আমাদের সকলের কাছে যে কত বড় প্রিয়পাত্র, শ্রদ্ধেয় ও সর্বোপরি আপনজন হয়ে আছেন তা আমরা মনে মনে আজও অনুভব করি। তাঁর বার্ষিক স্মৃতি-বাসরে আজ তাই তাঁকে স্মরণ করে তাঁর আত্মার উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করছি।

———

প্রণাম

—০—

আমাদের সমাজের নানা দুঃখ দুর্দ্দশা আছে। কিন্তু সব চেয়ে বড় দুর্দ্দশা আমরা আত্মসম্মানজ্ঞান-হীন পশুতে পরিণত হচ্ছি ক্রমশঃ। সমাজে আজ এমন কোন লোক নেই যাঁকে প্রণাম ক'রে আমরা ধন্য হতে পারি, যাঁর আদর্শ আমাদের মনুষ্যত্বকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এ যুগে স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়—আমাদের শ্রদ্ধেয় দাদাঠাকুর—এই রকম একটি প্রকৃত ব্রাহ্মণ ছিলেন। আজ তিনি নেই। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশেই সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করলাম। ধন্য হলাম।

—বনফুল

———

স্মৃতি-অর্ঘ্য

—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
সম্পাদক, কথাসাহিত্য

দাদাঠাকুরের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ না হলেও বহুদিনের। সেই কারণেই খুব অবাক লাগত যখন অনেকদিন পর পর দেখা হলেও ঠিক চিনতে পারতেন এবং কথাবার্তায় এক মুহূর্তে অন্তরঙ্গতার সুরটি বেজে উঠত। মনেও থাকত সব কথা। সাত আট মাস পরে দেখা হ'লেও আগের দেখা হওয়ার দিনটির তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার উল্লেখ করতেন।

সব চেয়ে তাঁর কথা মনে পড়ে ১লা বৈশাখের দিনটিতে। কলকাতায় থাকলে তিনি একবার আসতেনই। শেষ যে বার এসেছিলেন, সেই দিনটির কথাই বেশী মনে পড়ে। বেলা দুটো থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ছিলেন, বৃষ্টির জন্যেই আটকে পড়েছিলেন—কিন্তু সেই দীর্ঘ সময় যে কোথা দিয়ে কেটে গিয়েছিল তা আমরা কেউই বুঝতে পারি নি। আমাদের ছোট্ট আপিস ঘরে ভীড় জমে গিয়েছিল। তারপর যখন ফিরবেন—তখনও আকাশের অবস্থা বেশ খারাপ—গাড়িতে যেতে বললাম, কিছুতেই রাজী হ'তে চান না। ঐ পথ, ভীড়ের মধ্যে যাবেন, চোখে দেখতে পান না—আমরা এক রকম জোর করেই গাড়িতে তুলে দিলাম। ড্রাইভারকে বলে দিলাম যেন নিশ্চয় গোল্ডমোহর এভিন্যুতে পৌছে দিয়ে আসেন—দাদাঠাকুরের কোন আপত্তি না শোনেন। একটু পরেই গাড়ি ফিরে এল—শুনলাম কী একটা কৌশল ক'রে হাওড়া ব্রীজের এপারেই গাড়ি থেকে নেমে পড়েছেন—আর কিছুতে চড়তে রাজী হন নি। বেশ বুঝতে পারলাম, স্বাবলম্বী মানুষটির এই ক মিনিটের গাড়ি চড়াটাই কণ্টক-শয্যার মতো যন্ত্রণাদায়ক হয়েছিল।

——

পুণ্যস্মৃতি

—শ্রীনলিনীকান্ত সরকার

তেরই বৈশাখ আবার ফিরে এলো এক বৎসরের শূন্যতার শোকচ্ছায়া বহন ক'রে। এ শূন্যতার আর পূরণ হবে না। কেবল স্মৃতির সূক্ষ্ম ইথার-কণায় পূর্ণ হয়ে থাকবে এ মহাশূন্যতার মহাকাশ। দাদাঠাকুর এই মর্ত্যের মৃত্তিকা সরস-সুন্দর ক'রে রেখে অমরলোকে মহাপ্রয়াণ করেছেন গত বৎসর তেরই বৈশাখে। দাদাঠাকুর ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন এই তেরই বৈশাখেই। জন্ম আর মৃত্যু সর্বসাধারণের চক্ষে বিস্ময় জাগিয়ে দুটি ফুলের মতো ফুটে উঠ্‌লো এই দিবসের বৃন্তে! আজ তাঁর স্মৃতিবার্ষিকী।

স্মৃতিকথা দিয়েই স্মৃতিপূজার উদ্বোধন করি।

হাস্যরসে, প্রত্যুৎপন্নমতিতে, মহত্ত্বপ্রদর্শনে দাদাঠাকুরের অনন্যসুলভ ব্যক্তিত্বের কথা দেশবাসীর অবিদিত নেই। এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলাও হয়েছে। তবু তাঁর কথা ফুরোবার নয়। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে সে-সব মণিমুক্তা বহু স্থানে ছড়িয়ে আছে। তারই দু' চারটি কুড়িয়ে এনে 'জঙ্গিপুর সংবাদের' পাঠকপাঠিকাদের উপহার দিই।

দুটি শিরোনামার কথা—যাকে আমরা ইংরেজি বুলিতে হেডিং ব'লে থাকি। এই হেডিংএও দাদাঠাকুরের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল।

একটি ঘটনার কথা বলি: বিখ্যাত নাট্যকার পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের পরলোকগমন উপলক্ষে তখনকার অ্যালবার্ট হলে শোকসভা। সভাপতি—রসরাজ অমৃতলাল বসু। সভাপতি অমৃতলাল সেই সভায় স্বর্গত ক্ষীরোদপ্রসাদের সম্বন্ধে একটা বিরূপ মন্তব্য করায় হৈ হট্টগোলের মধ্যে সভা পণ্ড হ'য়ে যায়। একজন সম্পাদক বন্ধুর অনুরোধে তাঁর কাগজের জন্যে আমি সেই সভার আনুপূর্বিক বিবরণ লিখলাম। লেখাটি শেষ হবার পরক্ষণেই দাদাঠাকুর আমার বাড়ীতে উপস্থিত। লেখাটি প'ড়ে তিনি বললেন—"হেডিংটি ভালো হয়নি ভাই!"—ব'লে তিনি আমার দেওয়া হেডিংটি কেটে সেখানে বসিয়ে দিলেন—"মৃতের শোকসভায় অমৃত"। শিরোনামার জন্যেই লেখাটির মূল্য চতুর্গুণ বেড়ে গেল।

বিজ্ঞাপনের শিরোনামাতেও দাদাঠাকুর অতুলনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিজ্ঞাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা। আগে চোখ, তার পরে মন। এই জন্যেই বিজ্ঞাপনে থাকে নয়নমুগ্ধকর ছবি আর দৃষ্টি-আকর্ষণ-করা শিরোনামা। একটি প্রসাধন-সামগ্রী-উৎপাদনের প্রতিষ্ঠাতা দাদাঠাকুরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। বন্ধুটি দাদাঠাকুরকে একদিন অনুরোধ করলেন তাঁর একটি বিশেষ প্রসাধন দ্রব্যের জন্যে বিজ্ঞাপন লিখে দিতে। ইতিপূর্বে স্বত্বাধিকারী মহাশয় ঐ প্রসাধন-দ্রব্যটি দেশের গণমান্য ব্যক্তিদের উপহার দিয়ে অনেকের কাছ থেকেই প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করেছেন। দাদাঠাকুর সেগুলি দেখে তার ভিতর

থেকে দুটি প্রশংসাপত্র বেছে নিলেন : একটি সুভাষচন্দ্র বসুর ও অপরটি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের। সে সময় সুভাষচন্দ্র ও সেনগুপ্তের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দারুণ মতভেদ চলেছে। দুই পক্ষের দুই দল নানা সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে এই মতবিরোধ আরো তীব্র করে তুলেছে। তাঁদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে নিরপেক্ষ রাজনৈতিক নেতারা যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। তবু এ মতবিরোধ মেটেনি। এমন সময় সুভাষচন্দ্রের দলের মুখপত্র "লিবার্টি" কাগজে মোটা মোটা হরফে "হেড্ লাইন" দেখা গেল—"Subhash Chandra and Sen Gupta agrees." শিরোনামা দেখে অপ্রত্যাশিত সংবাদের আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে পাঠকেরা দেখলো—সেটি সেই প্রসাধন-দ্রব্যের বিজ্ঞাপন। ঐ শিরোনামার নীচে সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের দুটি প্রশংসাপত্র। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে সুভাষ ও সেনগুপ্তের মধ্যে মতবিরোধ নেই!

আর একটি ছোট ঘটনার কথা ব'লে দাদাঠাকুরের স্বভাবসুলভ রসিকতার একটুখানি নমুনা দিই।

সেকালের অর্থাৎ চল্লিশ বছর আগেকার পাঠকসাধারণ জানেন "শনিবারের চিঠি" কবি নজরুল ইসলামকে প্রতি সপ্তাহে কিরূপ কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করতো। প্রধান আক্রমণকারী ছিলেন সজনীকান্ত দাস। ছদ্মনামে অর্থাৎ গাজি আব্বাস বিট্‌কেল নামে লিখলেও লেখক যে সজনীকান্ত এ সংবাদ কলকাতার সাহিত্যিক সমাজের অজানা ছিল না। এ আক্রমণ চললো মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। কিছুকাল পরে ঘটনাচক্রে সজনীকান্ত ও নজরুলের মধ্যে মনোমালিন্য মিটে গিয়ে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই সময় শনিবারের চিঠির আপিসে ব'সে আছি আমি, সজনীকান্ত ও নজরুল। হঠাৎ সেখানে দাদাঠাকুর এসে উপস্থিত। আর, অবাক্ বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন নজরুলের দিকে। বললেন—"নজরুল! তুই শনিবারের চিঠির আপিসে? সজনীর কাছে ব'সে হাসছিস?"

সজনীকান্ত বললেন, "দাদা, আমাদের ঝগড়াঝাঁটি মিটে গিয়ে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়েছে।"

দাদাঠাকুর বললেন—"তোর বন্ধুত্ব তো? তুই আগে নজরুলকে গাল দিতিস 'গাধা' ব'লে, এখন বুঝি আদর ক'রে বলছিস 'গাধু'?"

॥ স্মৃতি-চারণ ॥

—কমল বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মশাইকে দেখার সৌভাগ্য বহুবার হ'য়েছিল। আর সেই সঙ্গে প্রতিবারের দর্শনে তাঁর অতুলনীয় বাক-চাতুর্য্যের পরিচয়ও পেয়েছিলাম। পণ্ডিত মশাই এর সঙ্গে রীতিমত বুঝেসুঝে কথা বলতে হ'তো। কোন্ কথা থেকে তিনি কি কথা টেনে আনবেন, সে সম্বন্ধে আগেভাগে কিছু বুঝবার ক্ষমতা কারও ছিল না। তাঁর ভাষা-জ্ঞানের সরসতা ছিল অপূর্ব্ব। অন্ততঃ কথা দিয়ে কথার মালা গাঁথার যে নৈপুণ্য পণ্ডিত মশাই এর মধ্যে দেখেছি, তা' সে বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী যে ভাষাতেই হোক্ না কেন, আজ পর্য্যন্ত সেই কথার খেলা আর কারও কাছে কখনও শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

উনিশ বছর আগের কথা। তখন আমরা মুর্শিদাবাদ সমাচার সবেমাত্র প্রকাশ ক'রতে আরম্ভ করেছি। রঘুনাথগঞ্জে এসে পণ্ডিত মশাই এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। সমাচার সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন তিনি ক'রলেন, অনেক উপদেশ দিলেন এবং সব শেষে বললেন : "বাবা, এডিটার হোস্‌নে, এড্-ইটার হোস্। নইলে আমার মত হ'বি।"

কথাটা ঠিক বুঝতে পারি নি। তাই বোকার মত তাঁর দিকে চাইতেই সেই পাকা গোঁফের ফাঁক দিয়ে মৃদু হাসি বেরিয়ে এল। তিনি বললেন :

"সোজা কথা বুঝলি না? এডিট'র (Editor) হওয়ার ঝক্কি অনেক। শুধু গাল খাবি আর সত্যি কথা লিখে শত্রু বাড়াবি। তবে এড্-ইটার (Aid-eater) হলে সবই লাভ। বুঝলি তো?"

তাঁকে বলেছিলাম, "জেঠামশাই, আপনিও তো এডিটার!"

"কিন্তু এ এডিটারী কি পারবি?"

সেদিনও ভেবেছিলাম, আজও ভাবি। সত্যিই কি পণ্ডিত-মশাই এর মত পত্রিকা সম্পাদক হওয়া যায়? আদর্শে অবিচল নিষ্ঠা রেখে, সত্য ও স্বাদেশিকতার পথ কখনও পরিত্যাগ না ক'রে প্রিয়-অপ্রিয়ের পার্থক্য না দেখে, তিনি যেভাবে সত্য পথে থেকে সংবাদ-পত্র সম্পাদনা ক'রে গিয়েছেন, সেইভাবে সম্পাদকের কাজ করা বর্ত্তমান কালে সকলের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই আমি মনে করি। পত্রিকা-সম্পাদক হিসাবেই নয়, তাঁর মত প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষই বর্ত্তমানে দুর্লভ।

জীবন্ত কিম্বদন্তী রূপে দেশের লোক পণ্ডিত মশাইকে চিনেছিল, তাঁর দেহান্তের পরও তিনি সেই কিম্বদন্তীই থেকে গেলেন। শোকে দুঃখে, সুখে আনন্দে অবিচল, এই তেজস্বী ব্রাহ্মণকে যাদের প্রণাম জানাবার সৌভাগ্য হয়েছে, তাদের কাছে তাঁর স্মৃতি অভ্রান্ত হ'য়ে আছে এবং থাকবে। তাঁর স্মৃতি আমাদের পক্ষে নিত্য স্মরণীয় হ য়ে আছে।

'দাদাঠাকুরের কন্যাদায়'

—সত্যেন্দ্রনাথ বড়াল।

—'কাজ না থাকে ত চল একটু আমার সঙ্গে'—

ভারী মিষ্টি সস্নেহ আহ্বান। কানে আসতেই চমকে উঠেছি।

কাজ ছিল অবশ্যি। কিন্তু সঙ্গে যাওয়ার আনন্দটুকু। সে যে আমার ভাগ্য। বেমালুম চেপে গিয়ে চলতে লাগলাম সঙ্গে। বৃদ্ধের পা, কিন্তু গতিবেগে তরুণকেও হারিয়ে দেয়।

রাজধানীর সিমেন্ট বাঁধানো ফুটপাত। এপ্রিল কী মে মাসের দশটা বেলার রোদে তেতে উঠেছে। ডাকলেন—আয় আমার ছাতার তলে।

গেলাম। কিন্তু ওঁর নগ্ন পাদুটো আমাকে পায়ে পায়ে লজ্জা দিতে লাগল।

স্মরণ করতে চেষ্টা করলাম চোখ খুলে আজ মুখ দেখেছিলাম কার। এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে এমন মানুষের দেখা নয় শুধু তাঁর সান্নিধ্যই জুটে গেল এই সকাল বেলা।

দাদাঠাকুর। কত বার তাঁকে দেখেছি কলকাতার রাজপথে। ঝাঁকা ভতি 'বিদূষক' কখনো মাথায়, কখনো ব্যাগ ভতি কাঁধে। চাই 'বিদূষক' হাঁকে চারপাশে ক্রেতার ভিড়। কত মানুষের সপ্রশংস উক্তিই কানে এসেছে—ধন্যি ঠাকুর—একাধারে প্রিন্টার, এডিটর, হকার। অদ্ভুত।

সামনের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে গর্বে আনন্দে আমার বুকখানা দশহাত হয়ে উঠেছে। এ মানুষটি আমার একান্ত আপন জন, আমার গাঁয়ের মানুষ, আমার পরম সুহৃদ।

চিৎপুরের এই দিকটা একটু সংকীর্ণ ছায়া ছায়া। রোদটা খাড়া পড়তে পায় না। ছাতার তলা থেকে বেরিয়ে এসে পেছন পেছন চলতে লাগলাম।

জিজ্ঞেস করলাম সসঙ্কোচে—আপনার পায়ে তাত লাগে না? খালি পায়ে……

'তাত'? হাসতে হাসতে জবাব দেন দাদাঠাকুর—লাগে বৈকি রে; তবে মাথাটা ঠাণ্ডা রাখলে পায়ে হাতে সবখানেই তাতটা মালুম হয় কম।

সংক্ষিপ্ত জবাব। উত্তরকালে বারবার এর তাৎপর্য উপলব্ধি করেছি। মাথা ঠাণ্ডা রাখা।

দূর অতীতে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডামাথা মহর্ষি সক্রেটিসের কথা মনে পড়ে যায়। কী ঠাণ্ডাই না ছিল মাথা ওঁর।

কোথায় যাচ্ছি জানিনা, জিজ্ঞেসও করিনি।

শেষে এসে উঠলাম দুজনে বিরাট একটা কোর্ট প্রাঙ্গণে। দাদাঠাকুর ফিরে বললেন—ওরে এই ভিড় ঠেলে যেতে হবে দোতলায়। সেরেস্তাদার বাবুর সঙ্গে একটু কথা আছে।

উকিলে মোক্তারে মক্কেলে মোহরারে গিজ্ গিজ্ করছে। অঙ্গন, বারান্দা, সামনের হল।

আমাদের দুজনকে দেখেই চিৎকার—আসুন আসুন ঠাকুর মশাই, ভাল উকিল, দুটাকায় হয়ে যাবে।

একজন ত দাদাঠাকুরের ছাতাই টেনে নেয়। —চলে আসুন, ও সব জুনিয়র উকিলের কাজ নয়। আমাদের স্যার পনর বছরের প্র্যাকটিশ, সেন্ট পারসেন্ট মামলা জিত।……

আমি ত তাজ্জব। দাদাঠাকুর অপ্রস্তুত।

একজন প্রবীণ মোহরার তাঁর জুনিয়র উকিলটিকে নিয়ে হাজির দাদাঠাকুরের সামনে। কী মুস্কিল। দাদাঠাকুর জনে জনে বোঝাতে চাইলেন্ তাঁর মামলা মোকর্দমা কিছু নাই, তিনি এসেছেন……

কে কার কথা শোনে! ওঁরা ছাড়বার পাত্র নয়।

পাঁচ পা এগোই ত তিন পা পিছিয়ে পড়ি।

দাদাঠাকুর কোন কথা, আমিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

বসে পড়লেন সামনে কী একটা গাছের নীচে বাঁধান বেদীটায়।

—এত দেখছি, দোতলায় সেরেস্তাদার বাবুর কাছে পৌছাতে গায়ের ছাল চামড়া ছিঁড়ে নেবে এরা। দাঁড়া, একটা ব্যবস্থা করি

ব্যবস্থা যে কী করবেন বুঝলাম না।

এক মিনিট। সটান উঠে পড়লেন, ছাতাটা বাগিয়ে নিয়ে বগলে। —আয় আমার ঠিক পেছন পেছন।

আবার তেমনি—আসুন স্যার, আসুন ঠাকুর মশাই, এইযে এদিকে।

করজোড়ে সবিনয়ে বলে ওঠেন দাদাঠাকুর—আমার কন্যাদায়, দয়া করে……

—আরে রাম, কন্যাদায় ত কোর্টে এসেছ কেন ধন। আর জায়গা পেলে না ……

ভদ্রলোক মোহরার প্রায় ধাক্কা মেরেই চলে যায় অন্যদিকে।

পরক্ষণেই আর একজন। এবার দাদাঠাকুরকে কিছু বলতে হ'ল না।

আগের ভদ্রলোক পিছন ফিরে চেঁচিয়ে ওঠে—আরে ছেড়ে দিন মশায়, ও বেটা কন্যাদায়। যত সব……

আর দেখতে হ'ল না। বিদ্যুৎগতিতে সারা কোর্ট প্রাঙ্গণে প্রচার হয়ে গেল—দাদাঠাকুরের কন্যাদায়।

পথ করতে হবে কি! আপনই পথ হ'য়ে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে আমি আর দাদাঠাকুর ঐ জনসমুদ্রে একেবারে অপাঙক্তেয় অস্পৃশ্য হ'য়ে গেলাম।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই গিয়ে হাজির খোদ সেরেস্তাদার বাবুর কাছে।

অবাক সকলে। সেরেস্তাদার বাবু সশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে দাদাঠাকুরকে একখানা চেয়ারে বসালেন, শুধালেন—তাত হ'ল দাদা, কিন্তু এই এগারটা বেলায় একেবারে এজলাসে এসে উঠলেন কী করে? এই জনারণ্যে একটা পিঁপড়েও যে গলে না।

চাদরখানা দিয়ে কপালের ঘাম মোছেন দাদাঠাকুর।

রসিয়ে রসিয়ে বললেন আনুপূর্বিক সব।

ত্রিশ বত্রিশ বছর পরে। সব কথা ঠিক মনে পড়ে না। সব শেষের দাদাঠাকুরের সহাস্য মন্তব্যটুকু এখনো যেন কানে বাজে—আরে ভায়া তোমাদের হাকিম হুকুমের এজলাসে কী সহজে আসা যায়। পথ করে দিল ঐ আমার কন্যাদায়।

—

দাদাঠাকুর স্মরণে

—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়।

দেখতে দেখতে দাদাঠাকুরের মৃত্যু এক বৎসর হয়ে গেল। এ যুগের শ্রেষ্ঠ রসিকশিল্পী দাদাঠাকুরের অমর আত্মার প্রতি আমি আমার অকৃপণ শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।

দাদাঠাকুরের সঙ্গে আমি শিশুকাল থেকে পরিচিত। আমাদের সংসারের সঙ্গে তাঁর মধুর সৌহার্দ্দ ছিল। প্রথম জীবনে তিনি "পণ্ডিত মশায়" বলে পরিচয় লাভ করেন। পরে আকাশবাণীর শিল্পী থাকাকালে "দাদাঠাকুর" বলে খ্যাতি লাভ করেন। দাদাঠাকুরের জীবনে প্রতিভার বীজ শিশুকাল থেকেই প্রসুপ্ত ছিল। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়ে বৃক্ষের আকারে নিতে লাগল এবং অবশেষে সেই বৃক্ষই ফুলে ফলে বিকশিত হয়ে এক বিরাট বনস্পতিতে পরিণত হন এবং সেই বনস্পতির সুশীতল ছায়ায় বহুজনের শোক দুঃখ প্রশমিত হতে লাগল।

দাদাঠাকুর যে কতখানি নিরহঙ্কার আত্মগরিমা-বোধশূন্য বিনয়নম্র মনোভাবের অধিকারী ছিলেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সহজ সরল বন্ধুবৎসল পরোপকারী। তাই বুঝি তিনি ছিলেন সকলেরই প্রিয় দাদাঠাকুর। কেউ কোন বিপদে কি অর্থকষ্টে পড়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি নিজের দারিদ্র্য উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতেন। নিজের জীবন বিপন্ন করে দারুণ যক্ষ্মারোগীকে মদনাপল্লীতে নিয়ে যেতে দ্বিধা করেন নি।

কত বার ট্রেনে তাঁর সঙ্গে ভ্রমণ করেছি, পথের কষ্ট কষ্ট বলেই মনে হয় নি। আমাদের বাড়ীতে ৺শ্যামাপূজার রাত্রে তাঁর সান্নিধ্যে সমস্ত রাত্রি কাটিয়েছি। তিনি গানে, ছড়ায় ও রসিকতায় আমাদের মনকে এমন অভিভূত করে রাখতেন যে রাত্রি কখন শেষ হয়ে যেত জানতেই পারতাম না।

"দাদাঠাকুর" যে কতখানি স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন তার পরিচয়ও পাই তাঁর জীবন থেকে। স্বদেশী যুগের অনেক বিপ্লববাদীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। গোপনে তাঁদের বহু কার্য্যের সহায়তা করতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁর বেশী ছিল না কিন্তু তিনি মুখে মুখে ইংরাজী বাংলা হিন্দী কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এক কথায় বলতে গেলে তিনি দেশের গৌরব। তাঁর শ্লেষাত্মক রচনা থেকে উদ্ধৃত করে আমি পুনরায় আমার অন্তরের ভক্তি ও প্রণাম জানাচ্ছি।

পণপ্রথাকে কটাক্ষ করে তিনি লিখলেন :—

"আঁতুর হইতে কলেজ খরচা
হিসেব করিয়া চার হাজার—
বাবার নিকটে নিয়েছ গুণিয়া
পুত্রের দাবি কেন আবার?"

——

॥ শরচ্চন্দ্রের হাসির কথা ॥

—শ্রীধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়।

গল্প শুনতে সবাই ভালবাসে। গল্পের কথা পড়লেই আসর জম্-জমাট। কিন্তু সব গল্পে সব আসর জমে কি? বোধ হয়, না। আসর জমিয়ে তুলতে, শ্রোতার মনকে আকৃষ্ট করতে পারে ক'জন? ছোট বড় মাঝারি—সব শ্রেণীর শ্রোতার মন জয় করা সব কথকের বা গাল্পিকের পক্ষে সম্ভব নয়। এ জন্য চাই গাল্পিকের ব্যক্তিত্ব এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

গল্প জানে না বা গল্প করতে পারে না এমন মানুষ বিরল। তবে গল্প বল্লেই তো হোলো না। গল্পের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করাও তো দরকার। এ ধরণের পরিমণ্ডল সহজে সৃষ্ট হয় হাসির কথায়। শ্রোতাদের মাঝে বসে হাসির কথায় তাদের মাতিয়ে তুলতে পারতেন হাসির কথার কথক শরৎচন্দ্র, অর্থাৎ দা'ঠাকুর। টুকরো টুকরো হাসির কথায় তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠতো। শুভ্র গুম্ফের ফাঁক দিয়ে বিচ্ছুরিত হতো তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস। আসর উঠতো জমে, শ্রোতার মনে লাগতো চমক। এমনি করে কথায় কথায় কখনো শব্দের কখনো কথার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে যেতেন। আর শ্রোতারা তাঁর মুখের পানে চেয়ে অবাক বিস্ময়ে রস সম্ভোগ করতো।

কথা দিয়ে তাক্ লাগানো তাঁর বৈঠকী গল্প—"রকমারি খাওয়া।" জন্ম হতে আমৃত্যু মানুষের রকমারি খাওয়া। ভূমিষ্ঠ হবার আগে থাকতে সে খাওয়া শুরু। তারপর খেতে না শিখতেই আর এক খাওয়া—যার নাম অন্নপ্রাশন। এহো বাহ্য। ইন্দ্রিয় দিয়ে আরম্ভ হয় খাওয়া—এ খাওয়া বিচিত্র এবং রকমারি। যেমন তাঁর কথায়—চোখে খাওয়া—লাজের মাথা; কানে খাওয়া—কানমলা; নাকে খাওয়া—খৎ; মাথায় খাওয়া—চাটি; গালে খাওয়া—চর, থাপ্পর; গলায় খাওয়া—ধাক্কা; পিঠে খাওয়া—চাপড়, মার; হাতে খাওয়া—সুদ, ঘুষ, মাহিনা; পায়ে খাওয়া—ঠোক্কর; পাছায় খাওয়া—আছাড়; ব্যবসায়ী খায়—লাভ; যুদ্ধে যারা যায় খায়—গুলি; ব্যারামে খায়—ঔষধ; নিজের কথা প্রমাণ করতে খায়—কসম, দিব্যি।

যুগের চিত্র ফুটেছে তাঁর "M. V. অবোধ গল্পে। ব্যাকরণের বেদনা-দায়ক পরিণতি ঘটেছে সদ্য পাশকরা ছেলে অবোধের সন্ধি প্রকরণ জ্ঞানে। অবোধ কুমার পার্শ্ববর্ত্তী ছাত্র উমেশের কাগজ নকল করে এবং নয়ন সলিলে হেড পণ্ডিত মহাশয়ের চরণ যুগল ধৌত করে সুবোধ ছাত্রের মত ছাত্রবৃত্তি "ঘরাও পরীক্ষায়" উত্তীর্ণ হলো। এখন হতে অবোধ কাওকে বড় একটা কেয়ার করে না। কথোপকথনে সে সাধুভাষা ব্যবহারে ত্রুটি করে না। কেউ তাকে নাম জিজ্ঞেস করলে সে বলত—'শ্রীযুক্ত অবোধকুমার, এম. ভি.।' অবোধের বিয়ে হলো। পিতাঠাকুর তাকে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের টোলে শিক্ষার জন্য যেতে বল্লেন। কিন্তু সে সম্মত হলো না। শেষে 'পিতাঠাকুরের উপযুক্ত ঔষধে অবোধ

রসিক

বাইরে শুকনো
ভেতরে সরস
যেন একখানা
আখ!
নীরস বঙ্গে
দেখলো সবাই
তোমার রসের
জাঁক!!

—কুমারেশ ঘোষ

আদর্শ বাঙালী খাঁটি মানুষ

দাদাঠাকুর শরৎ পণ্ডিত মহাশয়

জন্ম ১৩ই বৈশাখ, ১২৮৮/মৃত্যু ১৩ই বৈশাখ, ১৩৭৫

॥ সু—মো—দে ॥

আদর্শ বাঙালী কৃতী সুধী গুণী জ্ঞানী
শরৎ পণ্ডিত পদে জানাই প্রণাম
দেশবাসী গুণ গান গাহে অবিরাম
আদর্শের রূপায়ণে সচেতন জানি।
এ যুগে এরূপ মানুষ সত্যই বিরল
নির্ভীক পুরুষ সিংহ আত্ম সচেতন
বার্ণাড শয়ের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ বচন
ঘায়েল হয়েছে বাক্যে শঠ দুঁদে খল।
দাদাঠাকুরের জন্ম বীর বঙ্গ দেশে
বাঙালী সমাজ ধন্য দা'ঠাকুরে লভি
স্পষ্টবাদী সত্যাশ্রয়ী লেখক ও কবি
জাতিকে করেছে ধন্য বাংলাতে এসে।
বিদেহী আত্মার শান্তি অন্তর কামনা
বিকলাঙ্গ সু—মো—দে'র একান্ত প্রার্থনা।

পিতৃদেব স্মরণে

উদ্দেশে প্রণাম করি সজল নয়নে,
সতত কাঁদিছে হিয়া আপনা-বিহনে।
কত উপদেশ পেয়েছি আমরা
আপনার কাছে থাকি,
সৎপথে থেকে পালিব আদেশ
যা' কিছু রয়েছে বাকি।
বিষয়-বস্তু দু' ভায়ের হাতে
অকাতরে দেন তুলে,
একটী পয়সাও হিসাব তাহার
নেননি কখনও ভুলে।
আহার-বাহার সমান তালেতে
চলে নাকো এক সনে,
সংসার পথে চলিবার কালে
সতত রাখিব মনে।
বনেদী কাঙ্গাল বলিয়া নিজেকে
শান্তি পেতেন চিতে,
দেনা ক'রে টাকা দেখেছি আমরা
মুক্ত হস্তে দিতে।
অশীতি বর্ষীয়া বৃদ্ধা জননী
ভাসিছে নয়ন নীরে,
পুনর্মিলন হইবে কি কভু
অলকনন্দা তীরে?
মার মুখ চাহি বুক ফেটে যায়
পরনে শুভ্র থান,
ললাট লিখন কে করে খণ্ডন
বিধাতার অবদান।
ক্ষুরধার মেধা হাস্যরসিক
তুলনা নাহিক যার,
আপন তুলনা আপনি যে নিজে
বেশী কি কহিব আর।
নশ্বর দেহ পরিহার করি
গিয়াছ অমরধাম,
ক্ষণজন্মা পুরুষ হে পিতৃদেব
সার্থক তব নাম।
এহেন পিতার সন্তান হ'য়ে
বুদ্ধি নাইকো ঘটে,
লভিতে পারিনি একটী কণাও
থাকিয়া বালুকা-তটে।
আপনার স্থান হবেনা পূরণ
চিরতরে রবে ফাঁকা,
যতদিন রব গাহিব সুযশ
যা' আছে হৃদয়ে আঁকা।

॥ এক টুক্‌রো স্মৃতি ॥

—শ্রীমুকুলরঞ্জন রায়

কলেজের কয়েকদিনের ছুটিতে বাড়ী এসেছিলাম। কলেজ খোলবার আগের দিন আবার বহরমপুর চলেছি। ষ্টেশন, বাড়ী থেকে মাইল চারেকের কম নয়। খুব ভোরে বাক্স বেডিং একজন বাহকের মাথায় চাপিয়ে চলে এলাম রঘুনাথগঞ্জে। সেখান থেকে ষ্টেশনের বাসধরা আমার পক্ষে খুব সুবিধে ছিল। বাহক আমার বাক্স বেডিং একটি বাড়ীর বারান্দায় নামিয়ে রেখে পাগড়ীর সাহায্যে তার হাত পায়ের ধুলো ঝাড়তে লাগল। আমি ঐ বারান্দায় বসে পড়লাম। বাস আসতে তখনও অনেক দেরী।

কিছুক্ষণের মধ্যে পাশের গলি দিয়ে একজন বৃদ্ধ এলেন। মটর-ডালের বর্ণের মত দেহের বর্ণ, মুখে সাদা বড় বড় গোঁপ, পরনে ধুতি, গায়ে একখানা সাদা চাদর জড়ানো। বারান্দায় একটা মোড়া ছিল তিনি ওতে বসে পড়লেন।

আমি তাকে চিনি, কিন্তু তিনি আমাকে চিনতে পারবেন কি না সন্দেহ ছিল। তিনি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেন এই ভেবে আমি মনে মনে কিছু কথা সাজিয়ে গুছিয়ে নিচ্ছিলাম। হঠাৎ তিনি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কি? কোত্থেকে আসছ?"

আমি আগে নামটা বলে পড়ে বল্‌লাম—দফরপুর থেকে আসছি, বহরমপুর কলেজে পড়ি কিনা, তাই যাচ্ছি এখন। "তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, দফরপুর এখান থেকে ক মাইল?"

উত্তর দিলাম, "মাইল তিনেক ত বটেই।" উত্তর শোনে তিনি একটু যেন মুচকি হাসলেন। পরে আবার জিজ্ঞেস করলেন—"জঙ্গিপুর ষ্টেশন এখান থেকে ক মাইল হবে?" প্রশ্ন শুনে আমার বুকটা কেমন ধড়াস ধড়াস করতে আরম্ভ করেছে। বল্লাম, "এই দুই মাইল হবে।"

তখন তিনি বল্লেন—"তা তিন মাইল পথ ধুলো ভেঙ্গে আসতে পারলে, আর এই দুই মাইল পথ হেঁটে ষ্টেশন যেতে পারলে না?"

আমার মাথাটা ক্রমেই নীচু হয়ে যাচ্ছিল, একটু দূরে আমারই এক সহপাঠী গুড়ি মেরে আমাদের চারি চক্ষুর অন্তরালে দ্রুত চলে গেল। তারপর আর চোখ তুলে চাইনি; একটু পরেই বাস এল। তাকিয়ে দেখি বৃদ্ধ কখন উঠে চলে গেছেন।

বাসে উঠে বসেছি। কিন্তু একটু দূরে যেতেই আমার সেই বন্ধুটি হাত নাড়িয়ে বাস থামাল। আমার পার্শ্বে বসে বন্ধু জিজ্ঞেস করল,—"দাদাঠাকুর তোকে কি বলছিলেন রে?" আমি সব বল্লাম। "ঐ জন্যেই ত পণ্ডিত-প্রেসের দিকে আর গেলাম না" —বলেই বন্ধু আমার হাসতে লাগল।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

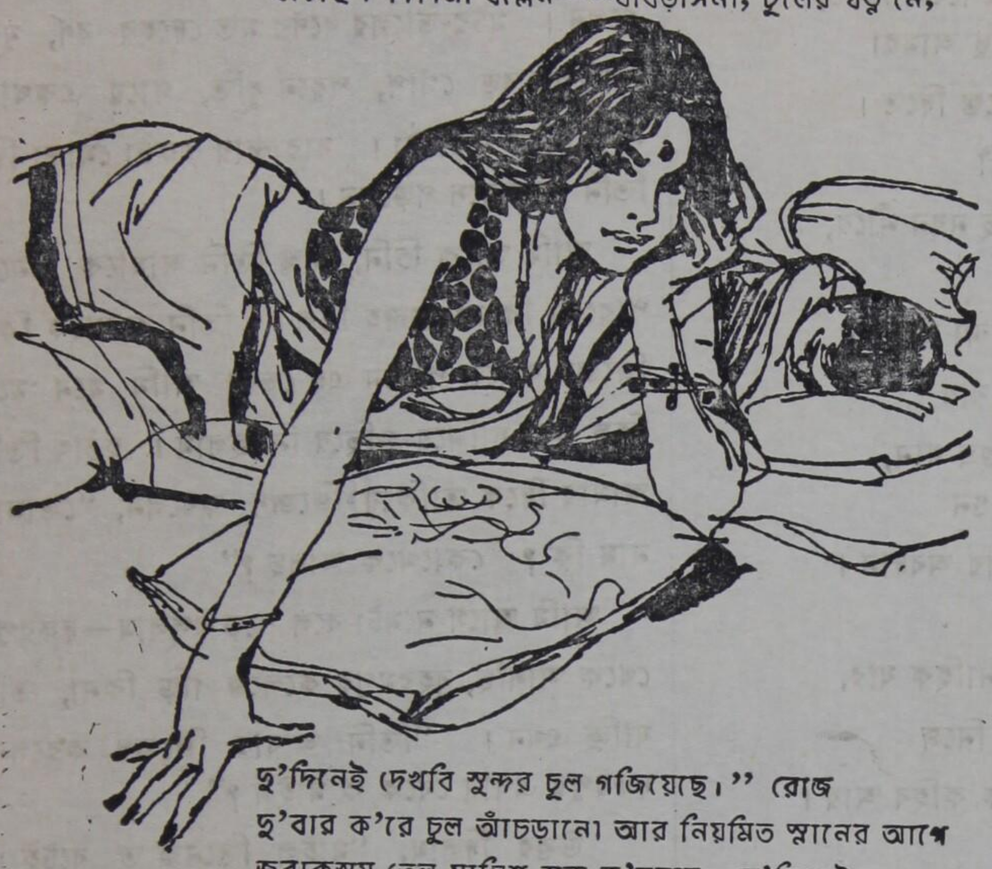

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ডেণ্টাল ক্লিনিক

ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামাণিক, ডেণ্টাল সার্জ্জেন

পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ **শ্রীরোহিণীকুমার রায়,** বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪'০০ চারি টাকা, শহরে ৩'০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১'২৫ এক টাকা পঁচিশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৬০'০০ ষাট টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩২'০০ বত্রিশ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১৮'০০ আঠার টাকা। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

"জন্মদিনে মৃত্যুদিনে দোঁহে যবে করে মুখোমুখি
দেখি যেন সে মিলনে

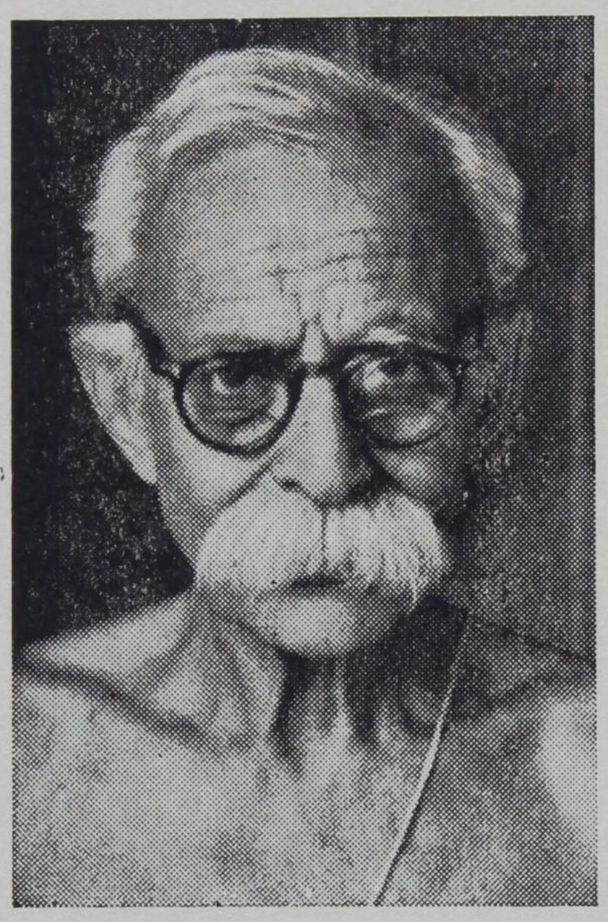

জন্ম—১৩ই বৈশাখ, ১২৮৮

তিরোধান—১৩ই বৈশাখ, ১৩৭৫

পূর্বাচলে অস্তাচলে
অবসন্ন দিবসের দৃষ্টি বিনিময়—।"